সুন্দরবন

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো ও মানিয়ে নেওয়ার জন্য নীতি সুপারিশ

সুন্দরবন, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র- মেঘনা উপত্যকায় পৃথিবীর অন্যতম বড় বাদাবন অঞ্চল। ভারতবর্ষের দিকের সুন্দরবন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কিমি জুড়ে ছড়ানো, গঙ্গা-ময়ূরাক্ষী-দামোদর-অজয়-কংসাবতীর বয়ে নিয়ে আসা পলিমাটিতে তৈরি আজ থেকে ২৫০০ ও ৫০০০ বছরের মধ্যের সময়ে[১]। সুন্দরবনের পূর্বদিকে ইচ্ছামতী-রায়মঙ্গল, পশ্চিমে হুগলি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর উত্তরে ড্যাম্পিয়ার হজ-সীমা। শতাধিক দ্বীপের মধ্যে মোটামুটিভাবে ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বসবাস।পুরো অঞ্চল জুড়েই সারাবছর চলে জোয়ারভাটা। জুলাই/ আগষ্টে যার উর্দ্ধসীমা প্রায় ৫ মিটার পর্যন্ত চলে যায়। তবে ৮টি প্রধান নদীর মধ্যে এখন কেবল হুগলি আর ইচ্ছামতী-রায়মঙ্গল দিয়েই মিষ্টি জল আসে। একদিকে বেড়েছে ভূমিক্ষয় অন্যদিকে ১৯৬৯ থেকে ক্রমশ কমছে মিষ্টিজল[২]।

সুন্দরবনে আপেক্ষিক আর্দ্রতা গড়ে ৮৮-৯০ শতাংশ। তাপমাত্রা সাধারণভাবে ১১°-৩৪° এর মধ্যে থাকে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ছাড়া মাঝে মাঝেই সারাবছর বৃষ্টি হয়। তবে ৮০% বৃষ্টি হয় জুন থেকে অক্টোবরের

---

[১] Allison et al, 2003
[২] Hazra et al 2001; 2010

মধ্যে। আর এর আগে পরে চলে সাইক্লোন[৩]। যেহেতু নানা জায়গা থেকে বয়ে আসা জল এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তাই বন্দর অঞ্চল থেকে চাষের জমি ধুয়ে নানা দূষিত রাসায়নিক জমা হয় এই সুন্দরবনে এসে। প্রায় ১৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৬ প্রজাতির পাখি আর ৫ রকম স্তন্যপায়ী প্রাণী এখন বিলুপ্তির পথে। তবুও এখনও সুন্দরবন জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কমে এলেও, এখন এখানে পাওয়া যায় ৬৩ রকম বাদাবনের গাছ, ১৪৪৩ রকম প্রাণী[৪]।

সুন্দরবন ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। গড় জমির পরিমাণ ০.৮২ হেক্টর এবং জমিওয়ালা মানুষের ৮৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। ধান চাষই এদের প্রধান জীবিকা। আগে দেশি-সহনশীল ধানের চাষ হলেও হাইব্রিড ধানের প্রচলন হওয়ায় ধীরে ধীরে সব হারিয়ে যাওয়ার মুখে[৫]। সাগরদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য ব্লকগুলি সড়কপথে জোড়া, তবুও বহু দ্বীপ এখনও হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ-এইসব পরিষেবার বাইরে।

১৯৮৭ সালে সুন্দরবনের অভয়ারণ্যকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তা সত্ত্বেও বনদপ্তর নানা কারণে যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনি। ১৯৮৮ সালের ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি এবং ১৯৯০ এর জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এর বিষয়টিকে নতুনভাবে দেখার সুযোগ করে দেয়। তার সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাদাবন অঞ্চল (১৯৯২) এবং জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য (১৯৯৬) নিয়ে দুটি নোটিফিকেশন জারি করেন। এর পরপরই নানা ধরনের কমিটি যেমন জঙ্গল সুরক্ষা কমিটি, পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি ইত্যাদি তৈরি হয়। সুন্দরবনের পরিবেশ বিষয়ে সুন্দরবন অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট ও বন দপ্তরেরই প্রধান ভূমিকা ছিল। ১৯৯১ এ পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তৈরি হয় সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-যার প্রধান দায়িত্ব হল নানা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে জাতীয় স্তরে জলবায়ু বদল মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা Natopmal Action Plan for Climate Change (NAPCC)। যাতে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের জন্য অবশ্য আলাদা করে কিছু

---

[৩] Choudhuri and Choudhuri, 1994
[৪] Majumdar, 2007
[৫] NBPGR, 2010

বলা হয়নি। হালে হয়েছে রাজ্য স্তরে জলবায়ু বদল মানিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা State Action Plan for Climate Change (SAPCC) সেখানেও সুন্দরবনের কথা ভাবা হয়েছে, জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের দিক দিয়ে, জল সংরক্ষণের কথায় অবশ্য এসেছে সুন্দরবনের কথা। উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা (Coastal Zone Manangement Plan) তৈরি হয়েছে ২০১০ সালে। এছাড়াও আলোচনায় আনা যায় ২০০৫ এর বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা।

কী আছে জলবায়ু বদল রাজ্যস্তরের পরিকল্পনায়

- চলতি প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু বদল সংক্রান্ত বিশেষ পরিকল্পনায় কিছু অতিরিক্ত কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেখানে জলসম্পদ, কৃষি, জৈববৈচিত্র ও জঙ্গল, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও শক্তিকে প্রয়োজনীয় বিষয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিমালয় ও সুন্দরবনকে ধরা হয়েছে বিপদগ্রস্থ দুই অঞ্চল হিসেবে কাজগুলির জন্য অধিক বরাদ্দ ভাবা হয়েছে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায়।
- এক অর্থে SAPCC পুস্তিকাটি (২০১০) মূল্যবান, কারণ এতে সামগ্রিকভাবে নানা সূত্র থেকে রাজ্যের জলবায়ু ও তার বদল সম্পর্কে তথ্যগুলি একত্রিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উপরের ৬টি বিষয়ের সমস্যা সম্ভাবনাগুলিও আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। কৃষির ভিতরে পশুসম্পদ ও মৎস্য চাষ ও গাছগাছালিকেও আনা হয়েছে। এসেছে সুসমন্বিত চাষের কথাও।
- সুন্দরবনের কথা নানা জায়গায় উঠে এলেও বিপদাপন্ন অঞ্চল হিসেবে- সুন্দরবনের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা বলা হয়নি। দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলার কথাও সেরকমভাবে আসেনি। সহযোগী সংগঠন হিসেবেও আসেনি কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অথবা বে সরকারি সংগঠনের নাম (WWF ছাড়া)। আপাতত ইনস্টিটিউট অফ এনভারনমেন্ট স্টাডিজ অ্যাণ্ড ওয়েটল্যাণ্ড ম্যানেজমেন্টকে (IFSWM) সমন্বয়কারী সংগঠন হিসেবে ভাবা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই একটি সম্পদ ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে অদূর ভবিষ্যতে।

সুন্দরবনের দিনবদল

- যদিও গত ১৮-২০০০০ বছর ধরে পৃথিবী চলছে উষ্ণ সময়ের মধ্যে দিয়ে, তবুও গত শতকের পণ্য নির্ভর সভ্যতাকেই আপেক্ষিক তাপমাত্রা

বাড়ার জন্য প্রধানত দায়ী করা হয়।

- সমুদ্রতল বাড়ছে বছরে ১২ মিমি করে[৬] তাতে সমুদ্রের তাপমাত্রার বাড়ারও ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। বঙ্গোপসাগরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে ০.১৯ সেন্টিগ্রেড প্রতিবছর এবং ২০৫০ এর মধ্যে সুন্দরবনের গড় তাপমাত্রা ১ সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা[৭]।
- গত ১২০ বছরে ঝড়ঝঞ্জার সংখ্যা বেড়েছে ২৬% বেড়েছে সেই সঙ্গে বৃষ্টি[৮]।
- সুন্দরবনের মানুষের সংখ্যা ১৯৫১ এর পর থেকেই বাড়ছে। অথচ ১৯৬৯ থেকে এখনও পর্যন্ত জমি কমেছে ২১৮ বর্গ কিমি[৯]।

যদিও এইসব বদলের ফলে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাপন ও প্রকৃতির অবস্থা, তবে তাকে সরাসরি জলবায়ু বদলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার মতো যথাযথ গবেষণা হয়নি এখনও। তবে

- ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ৫ শতাংশ জঙ্গল কমেছে।
- জলে ফাইটো প্ল্যাক্টনের উৎপাদন কমছে তাতে মাছের খাদ্যাভাব হবে। এমনিতেই মোহনা অঞ্চলে মাছের পরিমাণ কমে যাওয়ায় নানা ক্ষতিকারক পদ্ধতিতে মাছ শিকারের পরিমাণ বাড়ছে[১০]।
- গত ৩০ বছরে ৯০০০ মানুষ বসতবাড়ি হারিয়েছেন সমুদ্রতল বাড়ায়। ঝড়ঝঞ্জার মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০৩৫ মিলিয়ন টাকা। সাড়ে তেরো লক্ষ মানুষ এখনও বিপদাপন্ন[১১]।
- ২০০১ থেকে ২০০৮-এ মানুষ বেড়েছে, মানুষের বসবাসের জায়গা হয়েছে ১২১৬ থেকে ১৬৬৬ বর্গ মিমি। চাষের জমি হয়েছে ২১৮৯ বর্গমিটার থেকে ১৬৯১ বর্গমিটার[১২]।
- সুন্দরবনের মানুষের সংখ্যা এখন ৪৩.৭ লক্ষ। ১৯৫১ থেকে ২০০১ এর মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে ২২.৪% এবং ১৯৯১ থেকে ২০০১ এর

---

৬ Hazra, 2010
৭ Majumdar, 2007
৮ NBPGR, 2010
৯ N Hazra, 2010
১০ মৎস্য দপ্তর, ২০০৮
১১ Hazra, et al 2010
১২ Hazra, 2010

মধ্যে ১৮% । কোন কোন ব্লকে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৪০% এরও বেশি । প্রায় ২১% লোকের একবেলা খাবার জোটে না [১৩] ।

- কাজের অভাব থাকায় আয়লা পরবর্তী সময়ে প্রায় ৭৫% বাড়ি থেকে মানুষ বাইরে কাজ করতে যায় - ৯২% বাড়ির শিশুরা শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ।
- ১৯৯১ থেকে ২০০১ এর মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ১০%[১৪]। পানীয় জল, জ্বালানি, সংগ্রহের জন্য মহিলাদের দিনে প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়, যার পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে [১৫] ।

আমাদের এবং স্থানীয় মানুষজনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমরা আরও কিছু বিষয় উপলব্ধি করতে পারি

- সুন্দরবনের নিকাশি নালাগুলির মুখ বন্ধ করে মাছ চাষের ফলে বর্ষাকালে জল জমলে অথবা জোয়ারের নোনা জল গ্রামের ভিতরে ঢুকে এলে জল সরতে অনেক সময় লাগে।
- তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে শরৎ, হেমন্ত, বসন্তের মতো মধ্যবর্তী ঋতুগুলি লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে এবং এই সময়ের কুয়াশা, বৃষ্টিপাত, হওয়া ইত্যাদিও বদলে যাচ্ছে দ্রুত।
- গরম ও শীতে পানীয় জল ও চাষের জল কমেছে ব্যাপকভাবে।
- মাটির লবণাক্ততা বেড়েছে । সুন্দরবনের চাষযোগ্য জমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি আয়লার প্রভাবে।

এছাড়াও আরও বিস্তারিত তথ্য গত কয়েক বছরে প্রকাশিত সুন্দরবন সংক্রান্ত নানা গবেষণাপত্রে পাওয়া যাবে। তার মধ্যে এই তিনটি পুস্তিকা মূল্যবান

১। Engendering Climate Change/Alternative Future
২। Living with Changing Climate/CSE
৩। Sunderban delta - a vision/WWF

---

[১৩] Anon, 2011
[১৪] Anon, 2011
[১৫] Agenden policy, 2012

সুপারিশ

সমস্যা জর্জরিত সুন্দরবনের বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছেন নানাভাবে। কৃষি, জীবিকা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ- এই সব নানা বিষয়ে। জলবায়ু পরিবর্তন, সুন্দরবনের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছেও নতুন সমস্যা - আবার সুযোগও বটে। অনেকক্ষেত্রেই সংগঠনগুলি তাদের চিরাচরিত কাজকেই জলবায়ু পরিবর্তনের কাজ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। অবশ্য এই অঞ্চলের পরিবেশ ও মানুষের বিপদাপন্নতা এমন স্তরে, যে স্বাভাবিক উন্নয়নের কাজও মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সক্ষম করে তুলবে কোন না কোন ভাবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নীতি নির্ধারক ও নীতি রূপায়ণ কর্মীদের কাছে কয়েকটি সুপারিশ রাখতে চাই, যা হয়তো আমাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

১। সুন্দরবন, লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামানের জন্য NAPCC তে বিশেষ মিশন।

২। NDMA (National Disaster Management Authority) ২০০৫ এ উপকূলবর্তী ভাঙন ও সংলগ্ন অঞ্চলের নোনাভাবকে বিপর্যয় হিসেবে গণ্য করা ও সেই সংক্রান্ত নীতি। (পুর্নবাসন, ক্ষতিপূরণ, বীমা ইত্যাদি) তৈরি করা।

৩। মাটির নোনাভাব বা নোনাজল ঢুকে যাওয়ার জন্য ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির জন্য ফসল বীমা চালু করা। কারণ বর্তমান ফসলবীমার সুযোগ প্রধানত বিস্তির্ণ জমি এ কয়কটি ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪। কৃষি, সেচ, বিপর্যয়, ভূমি, বন ইত্যাদি দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় ও যুগ্ম পরিকল্পনা করার ব্যবস্থা।

৫। প্রধানত বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। যেমন শস্য, পানীয়জল, ওষুধ ও সাময়িক আশ্রয়ের জন্য উপকরণ, নৌকা ইত্যাদির পঞ্চায়েত স্তরে ভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার এবং স্থানীয় যুব ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় গ্রামস্তরে বিপর্যয় মোকাবিলার দল তৈরি করা। বিপদসংকেত পাঠানোর জন্যও সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় মানুষকে ও মোবাইল ব্যবস্থাকে জুড়ে নেওয়া দরকার। কমিউনিটি রেডিওকেও চালু করার কথা ভাবা প্রয়োজন।

৬। বিপর্যয় মোকাবিলা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি দপ্তরগুলি নিয়ে স্থানীয় পরিকল্পনা করা দরকার। এই পরিকল্পনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার।

৭। স্থানীয় কৃষি সংগঠনগুলির সাহায্যে লোকায়ত জ্ঞান ও নোনা ধানের বীজ, ফসল ইত্যাদির স্থানীয় সম্পদকেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার।

৮। কেবলমাত্র ফসলমুখী জীবিকা থেকে মানুষকে সরিয়ে এনে আয়ের উৎসকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে কৃষি, মৎস্য, বন, প্রাণী সম্পদ, খাদি গ্রামোদ্যোগ, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি দপ্তরগুলির বেড়া অতিক্রম করে একসাথে আসা দরকার।

৯। সুন্দরবন ভারতবর্ষে গবেষণার জন্য সবথেকে বেশি পছন্দের জায়গা-

অথচ এইসব গবেষণার ফলাফল এক জায়গায় করে জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলার কোন চেষ্টা এখনও করা হয়নি।

১০। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার ১৯টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। সুন্দরবনকে আলাদা জেলা হিসেবে ঘোষণা করলে নীতি পরিকল্পনা ও প্রয়োজন অনেক বেশি কার্যকরী ও উপযোগী হবে বলে মনে হয়।

১১। SAPCC-র নীতি পুস্তিকাটি কেবলমাত্র তথ্যে ভারাক্রান্ত। সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দপ্তর, অর্থ ও সময়সীমা বরাদ্দ করা দরকার এবং দরকার এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মানুষের অংশগ্রহণ।

প্রথম প্রকাশ : ২০১৩

© ডি আর সি এস সি

রচনা || অংশুমান দাশ || **সম্পাদনা** || সুব্রত কুন্ডু

প্রচ্ছদ অভিজিত দাস || **হরফ** শিপ্রা দাস || **রূপ** অভিজিত দাস ও শিপ্রা দাস

অর্থ-সহযোগ : European Union

|| **ছবি** ডি আর সি এস সি

মুদ্রক ও প্রকাশক :

সোমজিতা চক্রবর্তী

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

৫৮ এ ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২